বড় গল্প

কুহকিনী কিন্নরী

অদ্রীশ বর্ধন

অলংকরণ: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য (চিত্রচোর)

ব হু অজানা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের অন্দরমহল মহাশূন্য থেকে আচমকা আবির্ভূত হয়েছে এক মহাকাশপোত । আকারে আয়তনে তাকে উড়ুক্কু মহাদেশ বললেই চলে । হাজার হাজার আলোকবর্ষ পথ পেরিয়ে কল্পনাতীত এই যন্ত্রযান নিয়ে রাডাগ্রহে পৌঁছেছিল এক মহাসুন্দরী . .. উদ্দেশ্য ? পৃথিবী-পুত্র বিক্রমজিতের বধূ হওয়া… নয়তো তাকে খতম করা! কিন্তু এক ভয়ানক কর্দম -কুণ্ড আর মারাত্মক উষ্ণ প্রস্রবণ বানচাল করে দিলে তার সুচারু পরিকল্পনাকে! কীভাবে? আশ্চর্য এই কাহিনি না পড়লে তো তা জানা যাবে না! …

বিক্রমজিৎ ! পৃথিবীর মানুষ সে , পুরাতত্ত্ব তার পেশা ও নেশা — অথচ পৃথিবী থেকে নিযুত কোটি মাইল দূরের রাডাগ্রহ তার শ্বশুরালয় । মহাকাশের তিন হাজার পরার্ধ মাইল পথ পেরিয়ে আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্র -সূর্য অ্যালফা সেন্টারির রাডাগ্রহে পৌঁছে যায় চক্ষের নিমেষে-অত্যাশ্চর্য জেটারশ্মির দৌলতে !

বিক্রমজিৎ ! পৃথিবীর মানুষ হয়েও বহু আলোকবর্ষ দূরের রাডাগ্রহে পাড়ি দেওয়ার বিশেষ সম্মান আর সুবিধের অধিকারী সে ।

বিক্রমজিৎ ! পৃথিবীতে সে -ই একমাত্র মানব যে জেটারশ্মির রহস্য আয়ত্ত করেছে । রহস্যময় এই রশ্মি কখন কোন মুহূর্তে পৃথিবী আর রাডাগ্রহের মধ্যে আশ্চর্য সেতু রচনা করবে , তা একমাত্র সে-ই জানে । মহাশূন্যের অগুন্তি বিস্ময়ের অন্যতম বিস্ময় এই জেটারশ্মির দৌলতেই চক্ষের নিমেষে পৃথিবী থেকে রাডাগ্রহে এবং রাডাগ্রহ থেকে পৃথিবীতে নীত হয় বিক্রমজিৎ । টেলিপোটেশনাল রশ্মি বলা চলে জেটারশ্মিকে , অথবা ঈথার-বাহন । হয়তো চরম পরমাণুতে

রূপান্তরিত হয় বিক্রমজিৎ এবং চিন্তার বেগে কোটি কোটি মাইল পেরিয়ে এসে পুনরায় ফিরে পায় নিজরূপ । ইথারের এই ক্ষমতার ব্যাখ্যা অকাল্ট সায়ান্সে আছে , এ-যুগের শিশু-বিজ্ঞান এখনও তার নাগাল না পেতে পারে, কিন্তু জেটারশ্মি তো রয়েছে ।

বড় আজব গ্রহ এই রাডা। সুদূর নক্ষত্র-পরিবারে যেন পৃথিবীর প্রতিচ্ছায়া। যমজ পৃথিবী বললেই চলে। আমাদের পৃথিবীকেও যেমন আমরা আজও পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি — আজও অনেক অব্যাখ্যাত রহস্য চোখের সামনে থেকেও রয়ে গেছে মনের আড়ালে এই পৃথিবীর নানান অঞ্চলে —ঠিক তেমনি অনেক অদ্ভুত মহাবিস্ময় ছড়িয়ে আছে সুদূরের রাডাগ্রহে।

যেমন, সুপ্রাচীনকালের পারমিউভিয়ান সমুদ্র। প্যালিওজোয়িক যুগের বহু বিচিত্র জীবময় সেই যুগ কোনকালে মুছে যাওয়ার কথা ক্রমবিবর্তনের পায়ে পা মিলিয়ে।

কিন্তু তা যায়নি। অনেক অজানা প্রাণী আজও কিলবিল করে টহল দিচ্ছে নীলাভ আঁধারে রহস্যাবৃত এই সুপ্রাচীন সমুদ্রের অগম্য অঞ্চলে। সেই সমুদ্রের তলদেশে আজও দেখা যায় কিম্ভূত গড়নের চোরাপাহাড়ের শ্রেণি – উন্মাদ শিল্পীদের কল্পনাতেও যাদের রূপ-কল্পনা সম্ভবপর নয় কোনওমতেই। বিকট দংষ্ট্রা মেলে বিচিত্র বর্ণের এই পাথর আর পাহাড় হাজার হাজার বছর ধরে রাজত্ব করে আসছে সুপ্রাচীন এই সমুদ্রের নীলাভ অন্ধকারে – কি আছে তাদের সুড়ঙ্গ আর পাতাল-রন্ধ্রে … কেউ জানে না … জানবার দুঃসাহসও নেই কারোর।

একজনের ছাড়া। নাম তার বিক্রমজিৎ। পৃথিবী-পুত্র বিক্রমজিৎ!

অথচ সে এই রাডাগ্রহের মানব নয় – এ গ্রহে সে তো পরদেশি..! তবুও গ্রহের অজানা বিস্ময়-মহলগুলোয় অভিযান চালানোর দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবাহিত তার রক্তে। কারণ, পেশায় সে পুরাতত্ত্ববিদ – নেশাও বটে।

তাই রাডাগ্রহের কন্যা বধূ রঞ্জনাকে নিয়ে পাড়ি জমাতে চলেছে নীলাভ অন্ধকার থমথমে প্রাচীন সমুদ্রের অন্দরমহলে। জানতেই হবে অজানাকে – আকণ্ঠ জ্ঞান-পিপাসা যাকে দগ্ধে মারে অহোরাত্র – ব্রহ্মাণ্ডে কোনও বিপদকেই সে পরোয়া করে না।

নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল বধূ রঞ্জনা। বলেছিল – বিক্রম, নীল সমুদ্রে নাই বা গেলে? কি আছে ওখানে, কেউ তা জানে না – জানতে চায় না।

নক্ষত্রবেগে আকাশ থেকে অজানা সমুদ্রের দিকে গোঁৎ খেয়ে পড়তে পড়তে জবাব দিয়েছিল বিক্রমজিৎ – কিন্তু আমি জানতে চাই, রঞ্জনা।

ওদের দুজনের মুণ্ড ঘিরে গোল ফানুসের মতো ডুবুরি-গোলক। অফুরন্ত অক্সিজেনের জোগান আসবে তার মধ্যে সমুদ্রের জল থেকেই। জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বানিয়ে দেবে এই গোলক-সংলগ্ন পারমাণবিক যন্ত্র এবং হাইড্রোজেনকে জলে ছেড়ে দিয়ে অক্সিজেনকে টেনে নেবে গোলকের মধ্যে। ঘন্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এই গোলকের দৌলতে এরা টহল দিয়ে যেতে পারবে সমুদ্রের নামহীন আতঙ্কে ঘেরা অঞ্চলগুলোয়।

হাত-পা ছুড়ে সাঁতার কাটতেও হবে না। কেননা, দুজনেরই পিঠে বঁধা রয়েছে পারমাণবিক-জেট রকেট। জলের মধ্যেও সমান তেজে শক্তি সরবরাহ করে যায় বিজ্ঞানের বিস্ময় এই জেট – জল ছিন্নভিন্ন করে সূচিমুখ শলাকার মতো ধেয়ে নিয়ে যায় চালকদের।

প্রচণ্ড বেগে দুজনে নীল জলে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল এক্কেবারে তলদেশে … যেখানে কিম্ভূত আকার পাথর আর পাহাড় বিকট রূপে হাজার হাজার বছর ধরে পাহারা দিয়ে চলেছে নীল সমুদ্রের অজ্ঞাত রহস্যদের…

জলের মধ্যে ছুঁচ ঢুকে গেলে জল ছিটকোয় না — এদের ক্ষেত্রেও ঘটল তাই। বড় বড় ঢেউগুলোয় এতটুকু চাঞ্চল্য না জাগিয়ে নিমেষে দুজনে প্রবিষ্ট হল তাদের গভীরে…

নীল, সবুজ, লাল, গোলাপি এবং গাঢ় বেগুনি রঙের কিম্ভূত কিমাকার প্রবাল পাহাড়গুলোকে দেখা গেছিল একটু পরেই। আশ্চর্য এই নীলাভ অন্ধকারকে দূর থেকে যতটা নিরেট মনে হয়, কাছে এলে দেখা যায় মোটেই তা নয়। এ অন্ধকার অদ্ভুত রকমের স্বচ্ছ অন্ধকার – ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

পেছনে বুদবুদের টানা রেখা সৃষ্টি করে জলতলের রঙিন বিস্ময়দের আশপাশ দিয়ে সবেগে ধেয়ে যেতে যেতে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠেছিল রঞ্জনা – “হুশিয়ার, বিক্রমজিৎ।”

পাশ থেকে কৌতূহল প্রকাশ করেছিল পৃথিবী-পুত্র – "কেন, রঞ্জনা ?"

"প্রবাল পাহাড়দের আশে পাশে আর সুড়ঙ্গের মধ্যে জলতলের দানবরা থাকতে পারে। হাজার হাজার বছর ধরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে ওরা এখানেই।"

অট্টহেসে বললে অকুতোভয় বিক্রমজিৎ – "রঞ্জনা, পৃথিবীর লকনেস জলদানবদের কেউই দেখেনি। অথচ তারা নাকি প্রাগৈতিহাসিক পশুরক্ষক। স্কটল্যান্ডের লকনেস সরোবরে আজও চলছে তাদের দাপাদাপি। কত বৈজ্ঞানিক অভিযানই তো হয়ে গেল – লকনেস বিভীষিকা আজও তো কাউকে তাদের চেহারাগুলো ভালো করে দেখিয়েও গেল না।"

"কিন্তু এখানে তারা আছে।"

"অলীক কল্পনা, রঞ্জনা। কিংবদন্তির কল্পনা।"

রেগে যায় রঞ্জনা, "সব ব্যাপারেই ডানপিটেমি ঠিক নয়।"

আর এক দফা অট্টহেসে ওঠে বিক্রমজিৎ। ওর ভরাট পুরুষালি কণ্ঠের নিনাদী হাসি জলতলের প্রবাল পাহাড়গুলোয় ধাক্কা খেয়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ তুলে সরে যায় দূর হতে দূরে।

জলের মধ্যেও অবাধে কথা চলছে দুজনের মধ্যে। যে যন্ত্রের দৌলতে এই অসম্ভবটি সম্ভব হচ্ছে, তার আবিষ্কর্তা রঞ্জনার পিতৃদেব। অতি-শব্দকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি জলের মধ্যে দিয়ে মুখের কথাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। দুজনের মধ্যে নেই তারের যোগাযোগ – যেমন থাকে টেলিফোনে। স্থলে যেমন রেডিও – জলে তেমনি "সোনিক" – যার দৌলতে সাগরতলকে হাসির দমকে কঁপিয়ে দিচ্ছে একা বিক্রমজিৎ।

ওরা এখন বেগে ধেয়ে যাচ্ছে জলের তলার এক অপরূপ উপত্যকার ওপর দিয়ে। চারপাশে উচু উচু চোখা চোখা পাহাড় আর পাহাড়। জলে ডোবা পাহাড়। অথচ জলজ উদ্ভিদের দরুন দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন গাছ সবুজ ডাঙার পাহাড় কত রকম ভঙ্গিমায় নেচে কুঁদে হেলে বেঁকে রয়েছে। বেগুনি রঙের একটা বিশাল প্রস্তরস্তম্ভ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই পাক খেতে খেতে অনেকটা উঠে আবার ঢলে পড়েছে নীচের দিকে। বেগুনির মাঝে মাঝে উকি দিচ্ছে গোলাপি পাথর। হঠাৎ

দেখলে ভ্রম হয়, যেন বেগুনি আর গোলাপি ধোঁয়া নেচে এগিয়ে যেতে যেতে জাদুমন্ত্রবলে জমে পাথর হয়ে গেছে।

সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। জেটের স্পিড কমিয়ে আনে দুজনেই। এমন দৃশ্য রাডাগ্রহের ওপর কস্মিনকালেও দেখা যায়নি। পৃথিবীপৃষ্ঠেও কখনও দেখেনি বিক্রমজিৎ।

জলতলের বিভীষিকাদের আতঙ্ক এখনও মন থেকে যায়নি রঞ্জনার। যেতে যেতেই তাই বলে ওঠে – বিক্রম, রাডাগ্রহের দানবদের কিন্তু দেখেছে এ গ্রহের মানুষ। প্রাণ নিয়ে যে ক’জন ফিরে আসতে পেরেছে, তাদের মুখেই শুনেছি – এখানকার আতঙ্করা বুকের রক্ত জমিয়ে দিতে পারে শুধু বিকট চেহারাগুলোই দেখিয়ে—”

মৎস্যকন্যার মতোই রঞ্জনা তখন তীরবেগে জলতলের ঠিক ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে ভেসে যাচ্ছে দুহাত সামনে বাড়িয়ে। পরনের হলুদ জ্যাকেট আর ব্লু প্যান্ট অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে যেন অলৌকিক আভায়!

চোখের কোণ দিয়ে অপার্থিব আলোকচ্ছটা দেখতে পেয়েই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গেছিল বিক্রমজিৎ…

এবং সবিস্ময়ে দেখেছিল প্রোজ্জ্বল প্রস্তরটাকে!

পাথরের গড়ন যে এমনতর হতে পারে, তা না দেখলে প্রত্যয় হবে না কারোরই। পাথর তো হয় গোলাকার, নয়তো এবড়ো খেবড়ো তেড়া-বেঁকা। কিন্তু এ পাথরটা অবিকল অতিকায় শুঁয়োপোকার মতন এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে হেলে পড়েছে অন্যদিকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য পাথরটার রং। উজ্জ্বল হলুদ। সোনা হলেও হতে পারে। কিন্তু সোনা হোক কি যা-ই হোক – তা থেকে হলুদ দ্যুতি ঠিকরে আসবে কেন? দ্যুতিময় গোলকের মতো আলোকধারা বিতরণ করে যাবে কেন? আলোকবন্যা কিন্তু দেখা দিয়েছে অকস্মাৎ – রঞ্জনার ছিপছিপে বপু পাশ দিয়ে মৎস্যকন্যা ভঙ্গিমায় মন্থর গতিতে ভেসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে!

এতক্ষণ যা ছিল মৃত নিস্প্রাণ অজীব – আচমকা রঞ্জনার সান্নিধ্যে তার মধ্যে যেন প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সজীব ফানুসের মতোই হলুদ আলো ঠিকরে দিচ্ছে

রঞ্জনার দিকে!

চকিতে ফিরে ঘুরেই বিক্রম দেখেছিল সেই দৃশ্য! দেখেছিল, ‘সোনিক’ যন্ত্রের দীর্ঘ সরু অ্যান্টেনা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে হলুদ দ্যুতি। গোলকের দু পাশের হেডফোনের একটি থেকেও ঠিকরে যাচ্ছে হলদে আলো।

আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল বিক্রমজিৎ – ‘রঞ্জনা, হুঁশিয়ার!”

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছিল জলতলের বিভীষিকাকে!

না, রঞ্জনা তখনও দেখেনি। সে দেখেনি আশ্চর্য পাথরের অত্যাশ্চর্য আলো, দেখেনি পাথরের ওপর থেকে গম্ভীরি চালে ভেসে আসা নারকীয় আকৃতিটাকে।

দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল বিক্রমজিতের!

জলতলের বিভীষিকাই বটে। এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি রঞ্জনা।

এখনো তার সম্পূর্ণ দেহটা দেখা যাচ্ছে না। পেছনের দিকটা রয়েছে। হলুদ পাথরের আড়ালে। কিন্তু সামনের দিকটাই এমন ভয়াবহ যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় পলক দর্শনেই।

পৃথিবীর কোনও প্রাণীর সঙ্গে তার আকৃতির সামঞ্জস্য নেই। তার কিছুটা সরীসৃপ, কিছুটা কেঁচো, কিছুটা ড্রাগনের মতো। তার মুখটা তিমির মতো – চোখ দুটো কুৎকুতে এবং অতিশয় নৃশংস। তার থলথলে ভাঁজ করা এবং পাটে পাটে সাজানো লাল চর্মের খাঁজে খাঁজে বুঝি রৌরব নরকের বিভীষিকা বিধৃত। তার মুখবিবরের দুপাশ দিয়ে অক্টোপাশের রক্তলোলুপ শুড়ের মতো চারটে প্রত্যঙ্গ কিলবিলিয়ে জল তোলপাড় করছে বহু দূর পর্যন্ত!

এই পর্যন্ত নিমেষে দেখেই আর্তকণ্ঠে আবার চেঁচিয়ে উঠেছিল বিক্রমজিৎ, ‘রঞ্জনা! রঞ্জনা! রঞ্জনা!”

জেট-রকেটের স্পিড তুলে দিয়েছিল রঞ্জনা প্রথম হাঁশিয়ারি শুনেই – ঘাড় ফিরিয়ে দেখবারও সময় পায়নি। সামনের দিকে চেয়েই শুধু দেখেছিল, চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়েই নিঃসীম আতঙ্কে মুখচ্ছবি পাল্টে ফেলেছে দুর্ধর্ষ মানুষ বিক্রমজিৎ

এবং পরক্ষণেই তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এসেছে আকুল আর্তনাদ – রঞ্জনা! রঞ্জনা! রঞ্জনা!

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই জেট-রিকেটে তুমুল গতিবেগ তুলে ছিটকে সামনে ধেয়ে গেছিল রঞ্জনা।

একই সঙ্গে কোমরবন্ধ থেকে পারমাণবিক রশ্মিবন্দুক টেনে ট্রিগার টিপেছিল বিক্রমজিৎ।

পেন্সিলের চাইতেও সরু অতি-উত্তপ্ত মারণ-রশ্মি ধেয়ে গেছিল রশ্মিবন্দুকের নলচে থেকে জলতলের সেই বিভীষিকার দিকে ...

ছিটকে গিয়েই ঘুরে গেছে এখন রঞ্জনা এবং বিস্ফারিত হয়েছে চক্ষু-তারকা জলদানবের সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখে!

নাকের দুপাশ দিয়ে প্রসারিত চার-চারটে রক্তলোলুপ শুঁড় ছাড়াও এখন দেখা যাচ্ছে তার পেছনের চারটে পাখনা। মাছের ল্যাজ থাকে ওপর নীচে, তিমির থাকে পাশাপাশি – কিন্তু কিম্ভূত বিরাট এই দানবের ল্যাজে চারটে পাখনা রয়েছে ওপর নীচে ডাইনে বাঁয়ে। জাহাজের প্রপেলারের মতো এই পাখনা বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে সে টর্পেডো-সম বিশাল বপুটাকে অবিশ্বাস্য গতিবেগে নিয়ে এসেছে হলুদ পাথরের আড়াল থেকে বাইরে।

বিক্রমজিতের নির্ভুল লক্ষ্যের রশ্মি গিয়ে আঘাত হেনেছে তার পাকসাট খাওয়া বপুর ঠিক মধ্যিখানে।

কিন্তু এ কী আশ্চর্য! বিধ্বংসী মারণ-রশ্মির সংঘাতেও তো অবিচল রয়েছে দুঃস্বপ্নসম মহাদানব! রশ্মি তার গায়ে লেগেছে – রঙিন ফুলঝুরি ছড়িয়ে নিমেষে ছিটকে গেছে দিকে দিকে –

অথচ ভীমবেগে সে এগিয়েই আসছে রঞ্জনাকে লক্ষ্য করে – রশ্মি তার গায়ে যেন বিন্দুমাত্র আঁচড়ও কাটতে পারেনি – ফাটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা।

চার-চারটে লকলকে লোলুপ প্রত্যঙ্গ চার রকম ভাবে নাড়তে নাড়তে নরকের দূত সমানে ধেয়ে যাচ্ছে রঞ্জনাকেই লক্ষ্য করে।

ভীষণ আতঙ্কে চোখ ঠিকরে আসছে রঞ্জনার। উদ্বেগে মুখ কালো হয়ে গেছে বিক্রমজিতের।

রাডাগ্রহের মেয়ে রঞ্জনা। বিক্রমজিতের সহধর্মিনী রঞ্জনা। পৃথিবী-কন্যাদের মতো ভয়কাতুরে নয়। মূর্তিমান মৃত্যুদূতকে দ্রংষ্ট্রা মেলে করালরূপে এগিয়ে আসতে দেখেও জেট রকেটের ভেলকি দেখিয়ে মুহুর্তের মধ্যে সরে গেল তার চার-চারখানা কিলবিলে শিকার-পাগল শুঁড়ের আওতা থেকে।

নিস্তার নেই তার পরেও। চকিতের মধ্যে পাথরের আনাচ-কানাচ থেকে জল তোলপাড় করে বেরিয়ে এল আরও দুটো কালান্তক মূর্তি। একই জলদানব। টর্পেডোর মতো ভীমবেগে এবার তিনজনে ধেয়ে যাচ্ছে বেচারি রঞ্জনাকে লক্ষ্য করে। রঞ্জনাই যেন তাদের প্রিয় খাদ্য – বিক্রমজিৎ নয়।

জলতলের জল তখন ঘুলিয়ে উঠেছে তলানি তোলপাড় হয়ে যাওয়ায় – দূর থেকে বিক্রমজিৎ উদ্যত রশ্মিবন্দুক হাতে সমস্ত শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়েও তাক করতে আর পারছে না – একই লাইনে রয়েছে রঞ্জনা। তাছাড়া…তাছাড়া… রশ্মি হেনেই বা লাভ কী? এরা তো মরবে না রশ্মি সংঘাতে?

বিক্রমজিতের পরনের লাল টিউনিকের মতোই লাল হয়ে ওঠে তার চোখ জোড়া।

‘সোনিক’ যন্ত্রে ভেসে আসছে রঞ্জনার আকুল আহ্বান – “বিক্রম… বিক্রম! তিন দিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলেছে। রশ্মিবন্দুক হেনেও যখন এদের ঘায়েল করা যায় না, তখন এরা অবাধ্য – অন্ততঃ আমাদের জানা হাতিয়ারে। ওরা এখন আমাকে নিয়েই ব্যস্ত—আমাকেই ছিঁড়ে খাক – তোমার দিকে যখন নজর যায়নি এখনও — পালাও! প্রাণ নিয়ে পালাও বিক্রমজিৎ! নিজেকে বাঁচাও!”

না, গর্জে ওঠে বিক্রমজিৎ। পুরো দেহটাকে বিদ্যুৎগতিতে পাকসাট খাইয়ে নিয়েই উল্কাবেগে ধেয়ে যায় তিন মূর্তিমানের দিকে। তার সামনে প্রসারিত ডান হাতে ধরা রশ্মিবন্দুক থেকে মুহুর্মুহু ধেয়ে যাচ্ছে লোহিত রশ্মি। কেননা…

কেননা, ঠিক এই মুহুর্তেই একটা বিরাট প্রাণী তার লেলিহ দুটি প্রত্যঙ্গ দিয়ে সবেগে আঁকড়ে ধরেছে বধূ রঞ্জনার কটিদেশ এবং আকর্ষণ করছে নিজের দিকে।

মারণ-রশ্মি মুহুর্মুহু ফেটে পড়ছে তার বিশাল কলেবরের ওপর…

দাঁতে দাঁত চেপে ট্রিগার টিপেই চলেছে বিক্রমজিৎ।

এমন সময়ে সহসা আবির্ভূত হল আর-একটা নারকীয় বিভীষিকা!

এক্কেবারে নতুন চেহারা এর! সুবিশাল কৃষ্ণকায় ডানা মেলে রয়েছে দুপাশে। পেছনের ল্যাজ বলতে অতিদীর্ঘ অতিসূচ্যগ্র একটা বিষকাঁটা!

আগন্তুক করালমূর্তিকে দেখেই জেটের গতি অন্যদিকে চালিয়ে ছিটকে গেছিল বিক্রমজিৎ। কারণ, নতুন হানাদার ধেয়ে আসছে তাকেই লক্ষ্য করে!

বিক্রমজিৎ পলক দর্শনেই চিনেছে তাকে!

পৃথিবীতেও এই বিভীষিকা ধমনীর রক্ত বরফ করে দিয়েছে বহু ডুবুরির। একে দেখলেই নিদারুণ আতঙ্কে শীতল হয় সর্ব অঙ্গ। পৃথিবীতে এর নাম মাস্তা রে!

শিউরে ওঠে বিক্রমজিৎ! বিষকাটার ছোঁয়া লাগলেই যে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে নিমেষ মধ্যে, সে তা জানে! তাই পলায়ন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে করেছে এই মুহূর্তে।

অদূরে বিচিত্র আকারের হলুদ পাথর থেকে সমানে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে হলুদ রশ্মিধারা!

বিশালকায় মাস্তা রে জলতলের অতিকায় বাদুড়ের মতোই কালো ডানায় দুপাশ অন্ধকার করে দিয়ে বিক্রমজিতের ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি – ঠিক সেই সময়ে সাঁৎ করে ডবল ডিগবাজি খেয়ে ঘুরে গেল বিক্রমজিৎ এবং গোটা শরীরটাকে পেছন দিকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ফেলে রশ্মিবন্দুক থেকে মরণ-রশ্মি নিক্ষেপ করে গেল আগুয়ান কালান্তক বিভীষিকাকে তাক করে।

বিক্রমজিতের রশ্মি-নিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না কখনোই। এত কাছ থেকে হওয়ারও কথা নয়। রশ্মি সংঘাতে পাথর বিলীন হয়ে যায় – প্রাণীদেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা চক্ষের নিমেষে।

বিকটাকার এই বিভীষিকা কিন্তু সপ্ত-নরকের কদর্যতা নিয়ে এগিয়ে আসছে তো আসছেই – ব্রহ্মাণ্ডের কোনও শক্তিই বুঝি তাকে রুখতে পারবে না।

খটকা লাগে বিক্রমজিতের। দ্রুত কাজ করে চলে মস্তিষ্কের কোষগুলো। একই সঙ্গে সক্রিয় হয় যুক্তি, বুদ্ধি, কল্পনা।

মাস্তা রে! সে তো পৃথিবীর প্রাণী! রাডাগ্রহের সুপ্রাচীন সমুদ্রের অতলে তার আবির্ভাব ঘটল কেন?

কোথায় যেন একটা বিশাল গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে।

ওদিকে তিন বিকটদেহী নিরন্তর গতিবেগে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জনাকে প্রবাল পাহাড়গুলোর গোলক ধাঁধার অভ্যন্তরে…

এদিকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে একই সঙ্গে মারণাস্ত্র প্রয়োগ করছে বিক্রমজিৎ… মাথা কাজ করে যাচ্ছে অধিকতর গতিবেগে!

আচম্বিতে উর্বর মস্তিষ্কে ঝলসে ওঠে বিপুল প্রহেলিকার অতীব সরল সমাধান।

যত নষ্টের মূল ওই প্রদীপ্ত হলুদ পাথর!

নিশ্চয় তাই! যে মুহূর্তে রঞ্জনা পাথরটার পাশ দিয়ে গেছে – অমনি যেন ইলেকট্রিক বালবের মতোই অতিপ্রাকৃত শক্তিতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল হলুদ পাথর।

অতএব …

বিক্রমজিতের শরীরের শক্তি তখন নিঃশেষিত প্রায়। অসীম অবসাদে শরীর যেন আর চলছে না। তা সত্ত্বেও, সমস্ত শক্তি সংহত করে অপরিসীম মনোবলে ঘুরে গেল সে …

এবং নিভুল লক্ষ্যে উপযুপরি রশ্মিবর্ষণ করে গেল প্রতীকী প্রহেলিকা হলুদ প্রস্তরকে লক্ষ্য করে…

রেণু রেণু হয়ে দশ দিকে ছিটকে গেল হলুদ পাথরের ধ্বংসাবশেষ …

ঘুলিয়ে ওঠা জল একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে গেল গুঁড়ো পাথর থিতিয়ে যাবার পর…

একই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল চার-চারটি নিশার দুঃস্বপ্ন!

জলতল এখন শঙ্কাশূন্য! চারিদিকে যেন অশ্রুত হাসি, হররা আর বিজয়োল্লাস!

হাসি মুখেই নীলাভ স্বচ্ছ অন্ধকার ফুঁড়ে রঞ্জনার সামনে আবির্ভূত হয়েছে মহাবীর বিক্রমজিৎ। হাসিতে অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতা – যা এই পৃথিবী-পুত্রের নিজস্ব সম্পদ।

রঞ্জনার দুই চোখে এখন গভীর শান্তি। আর একবার চোখের সামনে সে দেখল কিভাবে চক্ষের নিমেষে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে বিক্রমজিৎ নিছক বাহুবল দিয়ে নয় – বুদ্ধিবলের সহযোগে।

বললে প্রশান্ত প্রসন্ন স্বরে, "বিক্রমজিৎ! আবার ফিরে পেলাম সাধের প্রাণ – স্রেফ তোমার দৌলতে। কিন্তু চার-চারটে দানব একেবারেই যে অদৃশ্য হয়ে গেল – যেন গলে গলে জলে মিশে গেল – ব্যাপার কি বলো তো?"

রঞ্জনা, পেছনে বুদবুদের অবিরল রেখা টেনে আরও এগিয়ে এসে বললে বিক্রম, 'ওরা মায়াদানব – ক্ষতি কারোরই করবে না – করতে পারে না!"

"মায়দানব! মানে?"

"যে পাথরটাকে এক্ষুনি গুঁড়িয়ে পাউডার করে দিলাম, ওই পাথর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেই শক্তি চালনা করে গড়ে তুলতো কল্পনার বিভীষিকাদের। পাথর ছাতু করে দিলাম – রাডাগ্রহেও এই কল্প-দানবদের আর দেখা যাবে না।"

বলতে-বলতে বিক্রমজিৎ ধেয়ে যায় ওপর দিকে – জেট চালিয়ে নক্ষত্রবেগে উঠে যায় জলের ওপর … মাথা থেকে 'সোনিক" গোলক খুলে হাতে ধরতে না ধরতেই ফিকে হয়ে আসে তার দেহ …

দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায় বিক্রমজিৎ শূন্যপথেই।

জেট চালিয়ে ওর পেছনেই জল ছেড়ে উঠে এসেছিল রঞ্জনা। চোখের সামনেই দেখতে পেল প্রথমে অনচ্ছ হয়ে গিয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল বিক্রমজিৎ …

কিন্তু চমকে উঠল না মোটেই।

বললে শুধু আপন মনে, “জেটারশ্মি মিলিয়ে গেল। যাঃ!”

জেটারশ্মি বাহিত হয়েই তো পৃথিবী থেকে নিমেষ মধ্যে রাডাগ্রহে এসেছিল বিক্রম – অব্যাখ্যাত সেই রশ্মিই সরে গেল – চকিতে বিক্রমজিৎকে নিয়ে গেল পৃথিবীর বুকে।

অন্তত তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত রইল রঞ্জনা।

কিন্তু আসলে তা ঘটল না।

অন্যান্য বারের মতো রাডাগ্রহে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে বিক্রমজিৎ — পরক্ষণেই আবির্ভূত হয়েছে পৃথিবীতে।

এবারে ঘটল অন্যরকম।

আচমকা বিক্রম দেখলে, সে আর রাডাগ্রহে নেই, রয়েছে একটা দানবিক চেহারার মহাকাশযানের মধ্যে!

এক হাত আর এক হাঁটু যে মেঝেতে রেখে তাল সামলাচ্ছে বিক্রম, সে মেঝে মসৃণ ধাতু দিয়ে গড়া। অজানা ধাতু। গাঢ় হলুদ রঙের। অনেক উঁচুতে হালকা বেগুনি রঙের সিলিং। ঠিক পেছনেই একটা প্রকাণ্ড কাচের মতো বস্তুর স্ক্রিন। পোল্লায় সিনেমা হলের বিরাট পর্দার মতোই। অগুন্তি নক্ষত্র খচিত সীমাহীন মহাকাশের ছবি সেখানে দেদীপ্যমান!

বিমূঢ় বিক্রম ভেবে পায় না, চকিতে এ কী কাণ্ড ঘটে গেল! ম্যাজিক নাকি? জেটারশ্মি তো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সবুজ পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে! এখানে … এই একান্ত অপরিচিত মহাকাশযানের মধ্যে তো তার আসার কথা নয়! এল কিভাবে? কেন ?

বিশাল হলঘরের প্রতি বর্গ ইঞ্চি নির্মিত অজানা ধাতু দিয়ে। হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে থাকায় বিক্রমজিৎ বুঝতেও পারছে, বিরামহীনভাবে কেঁপে চলেছে ধাতুর চাদর। কোথায় যেন একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন চালু রয়েছে – ক্ষীণ শব্দও ভেসে আসছে কানে।

সর্বাঙ্গ টান টান হয়ে যায় বিক্রমের। সাগরের বিভীষিকাদের শেষ করতে না করতেই আসন্ন নয়া বিভীষিকাদের জন্যেই বুঝি শক্ত হয়ে ওঠে ওর সর্বাঙ্গ।

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে সজাগ চক্ষু বোলায় চতুর্দিকে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পায় আসন্ন বিপদের সংকেত … যে কোনো মুহূর্তে শুরু হবে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানির খেলা …

আচমকা সরে গেল দেওয়ালের কিছুটা অংশ।

আয়তাকার একটা গবাক্ষ দেখা যাচ্ছে সেখানে।

আর দেখা যাচ্ছে একটা বিদঘুটে রশ্মিবন্দুক। ফোকরের মধ্যে দিয়ে রে-গানের নলচে বেরিয়ে এসে তাগ করছে ওর দিকেই।

মৃত্যু-রশ্মি নলচের ভেতর থেকে ঠিকরে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড লাফ মেরে সরে যায় বিক্রমজিৎ পাশের দিকে …

রক্ত রঙের শক্তিপুঞ্জ আছড়ে পড়ে ঠিক সেইখানে যেখানে ও ছিল একটু আগেই।

সঙ্গে সঙ্গেই চালু হয়ে যায় বিক্রমের রশ্মিবন্দুক। শত্রুকে আর দ্বিতীয় সুযোগ দিতে সে প্রস্তুত নয়। এবারের শক্তিপুঞ্জ লক্ষ্যভ্রষ্ট নাও হতে পারে …

নিমেষে গলে যায় হানাদার রে-গান। বিক্রমের রশ্মি অমোঘ নিশানায় স্পর্শ করেছে মারণ-হাতিয়ারকে।

কিন্তু ও কী! ওদিকের দেওয়ালেও যে আবির্ভূত হয়েছে গবাক্ষ! সেখান দিয়েও মুখ বাড়িয়েছে একটা নলচে – লক্ষ্য বিক্রমজিৎকেই!

ঠিক তখনি সুবিশাল স্পেসশিপের অন্য এক অংশে দেখা যাচ্ছে চমকপ্রদ এক দৃশ্য।

অগুন্তি যন্ত্র ঠাসা রয়েছে এ ঘরের অন্ধকারে। সব যন্ত্রের নায়ক একটি বিশাল কমপিউটার। সজীব প্রাণীর মতোই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গমগমে স্বরঃ

ইন্দ্রাণী, তোমার হুকুম পালন করেছি। বিক্রমজিৎকে টেলিপোর্টেশনাল রশ্মি দিয়ে তুলে এনেছি এখানে। ওর মগজ আর মনের ভেতর পর্যন্ত দেখেছি। তোমার বর হওয়ার উপযুক্ত সে। গলদ শুধু এক জায়গায়।

কী গলদ? কমপিউটারের সামনে বসে থাকা ইন্দ্রাণী বললে মিহি গলায়। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তার অবয়ব।

রাডাগ্রহের মেয়ে রঞ্জনা যে তার বউ!

মাথা থেকে সরিয়ে দাও রঞ্জনার ছবি। মৃদু কিন্তু কঠিন স্বর ইন্দ্রাণীর।

তাই হবে। রঞ্জনাকে যাতে ভুলে যায়, সে ব্যবস্থা আমরা করছি। বিক্রমজিতের স্মৃতি হাতড়ে পৃথিবীর এক কিংবদন্তির কথা জানতে পেরেছি। ইন্দ্রাণী, তোমার কাজে লাগতে পারে, তাই শোনো। রাইন নদীর পাড়ে এক জাদু পাথরের আড়ালে নাকি থাকে বিশ্বের সেরা রূপসী লোরেলি। লোরেলির চাহনিতে জাদু, কথায় জাদু, যে কোনো পুরুষকে ভুলিয়ে বর বানিয়ে রাখতে তার জুড়ি নেই। ইন্দ্রাণী, তোমাকে এই লোরেলির মতো হতে হবে – তবেই পারবে বিক্রমজিতের বউ হতে।

লোরেলি! সাপের মতো হিসহিসিয়ে ওঠে ইন্দ্রাণী – আমাকে লোরেলির মতো করে দিতে পারবে না?

পারব। আমরা, যন্ত্ররা, পারি না হেন কাজ নেই, ইন্দ্রাণী। বসো চুপ করে। দ্যাখো কি করি।

নীরব হল যন্ত্র। এতক্ষণ গাঢ় আঁধারে গা ঢেকে বসেছিল ইন্দ্রাণী। অকস্মাৎ অপূর্ব আলোক বন্যায় ভেসে গেল ঘরটা। যন্ত্রের মধ্যে থেকেই ঠিকরে আসছে আশ্চর্য এই আলো। আশ্চর্য এই কারণে যে, আলোর মধ্যে এত রঙের তরঙ্গ কেউ কখনো দেখেনি।

ইন্দ্রাণী টুলের ওপর বসে আছে পিঠ খাড়া করে। রঙের ঢেউ তাকে ঘিরে ঘিরে নেচে যাচ্ছে। এ আলো যে নিছক আলো নয় – রাসায়নিক দ্যুতি, একটু একটু করে তা বোঝা যাচ্ছে। হরেক রঙের রসায়ন তার লোমকূপের মধ্যে দিয়ে শরীরে গিয়ে একটু একটু করে পরিবর্তন আনছে দেহযন্ত্রগুলোয়। পালটে যাচ্ছে অবয়ব।

একটু আগেই যে ছিল অমানবিক চেহারার – এখন সে পুরোপুরি মানবী। অসামান্য মানবী। তার রূপের আলোয় ঘর যেন ঝলমল করছে।

যন্ত্রের আলো এখনও ধুইয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গ রঙিন কেমিক্যাল দিয়ে। গমগমে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে বিশাল মেশিনের বুকের ভেতর থেকে – ইন্দ্রাণী, বিশ্বের সেরা সুন্দরী হয়ে যাচ্ছো তুমি। তোমাকে দেখলে, তোমার বীণার মূচ্ছর্নার মতো কণ্ঠস্বর শুনলে তোমাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে যাবে বিক্রমজিৎ – ভুলে যাবে তার বধূ রঞ্জনাকে।

স্তব্ধ হল যন্ত্র। মিলিয়ে গেল রঙিন আলোর ফোয়ারা। টুল ছেড়ে উঠে গিয়ে মেঝের মাঝেই খাড়া এক মুকুরের সামনে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী।

মুকুর বলে তাকে বোঝা মুস্কিল। যেন একটা মার্বেল পাথরের চাঁই। কিন্তু ইন্দ্রাণী তার সামনে দাঁড়াতেই জাদু আয়না হয়ে গেল যেন বিচিত্র পাথরটা। ইন্দ্রাণীর আপাদমস্তক প্রতিফলিত হয়েছে অদ্ভুত সেই দর্পণে।

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারে না ইন্দ্রাণী! এত সুন্দরী সে! যন্ত্র কি জাদু জানে? কিংবদন্তির লোরেলি কি সত্যই এত রূপসী?

মুগ্ধ হয়ে যায় ইন্দ্রাণীর নিজের চেহার দেখেই।

বলে আপন মনে – পৃথিবী-পুত্রর কাছে সুন্দরী বলতে তাহলে বোঝায় এই আকৃতিকেই? সৌন্দর্যের এই ধারণাই বাসা বেঁধে রয়েছে ওর মাথায়। বেশ! বেশ! ওর ভ্রান্ত বিশ্বাসই এবার সত্যি হয়ে দাঁড়াবে ওরই চোখের সামনে। কিংবদন্তির কিন্নরী – সজীব কুহকিনী হয়ে ছলনার জাল পাতবে পৃথিবী-পুত্রের মগজে – ভুলবে সে, ভুলে যাবে বধূ রঞ্জনাকে – সেরা রূপসী বলতে যাকে বোঝে বিক্রমজিৎ, অবিকল সেই রূপ নিয়ে আমি হাজির হব তার সামনে!

সেকেন্ড কয়েক পরেই খুলে গেল হাতিয়ার কক্ষের দরজা। মসৃণ দেওয়ালের গায়ে সরে গেল একটা প্যানেল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী।

বিক্রমজিতের মুখোমুখি।

বুক চিতিয়ে রশ্মিবন্দুক উদ্যত রেখেছে বিক্রমজিৎ। এখানে কাউকে বিশ্বাস নেই। বিপদ আসতে পারে অনেক রকমের রূপ নিয়ে।

কিংবদন্তির কিন্নরী বললে বীণানিন্দিত কণ্ঠে, “হাতিয়ার ফেলে দাও, বিক্রমজিৎ। আমার ইলেকট্রনি ব্রেন তোমার মগজের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিয়েছে। বিপদের মুখোমুখি না হলে সজাগ হত না তোমার মগজ – তাই রে-গান উঁচিয়ে বিপদের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে। ভয় নেই – হাতিয়ার নামাও-”

চক্ষু সঙ্কুচিত হয় বিক্রমজিতের। অজানা স্পেসশিপে এহেন অপরূপাকে দেখবার প্রত্যাশা সে করেনি।

বললে, “অচিন গ্রহের অপরূপা, কে তুমি? এখানেই বা এলে কি করে?”

নীল চোখ মেলে বললে সুনয়না, “আমার নাম ইন্দ্রাণী। বিশাল এই স্পেসশিপে মানুষ ছিল অনেক – এখন আমি ছাড়া আর নেই কেউ। অনেক অনেক বছর আগে গ্রহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আমার পূর্বপুরুষরা – সে গ্রহ ধ্বংস হতে চলেছে জেনেই। আর ফিরে যেতে পারেনি সেখানে। সে গ্রহই আর নেই বিক্রমজিৎ, অবিকল পৃথিবীর মতোই ছিল সেই গ্রহ – বরং আরও সুন্দর। সেখানকার মেয়েরা ছিল পরীর মতো, ছেলেরা দেবদূতের মতো। আমাকে দেখে বুঝছো না? একে একে পূর্বপুরুষদের সবার আয়ু যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আমি নেহাতই শিশু। এই স্পেসশিপের ইলেকট্রনি ব্রেন আমাকে মানুষ করেছে – এত বড় করেছে।”

ইন্দ্রাণীর কথায় কি জাদু আছে? মন্ত্রধ্বনির মতো প্রতিটি শব্দ একটু একটু করে প্রভাব বিস্তার করছে বিক্রমজিতেরই অণু পরমাণুতে – একটু একটু করে শিথিল হয়ে আসছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ – অসাড় হচ্ছে মস্তিষ্ক।

ইন্দ্রাণীর নীল চোখ দিয়েও যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সম্মোহনী শক্তি, “বিক্রমজিৎ, বড় হওয়ার পর বুঝলাম একলা থাকা সম্ভব নয়। আমারও সঙ্গী চাই। আমারও বর দরকার। কিন্তু মহাকাশযানে ভারহীন অবস্থায় মানুষ হয়েছি বলে কোনও গ্রহতেও নামতে ভরসা পাই না – সেখানকার মাধ্যাকর্ষণ তো আমি সইতে পারব না। এই সময়ে খবর পেলাম তুমি এসেছ রাডাগ্রহে। আমার টেলিভিউয়ার-এর মধ্যে দিয়ে দেখলাম তোমাকে। মনে মনে ঠিক করলাম, বিয়ে যদি করতে হয় তো করব তোমাকেই।”

বিক্রমজিৎ এবার সত্যিই সম্মোহিত হয়ে গেছে। বড় বড় হয়ে গেছে তার দু-চোখের তারা। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নীল নয়না লোহিতবসনা গৌরী

মেয়েটির দিকে।

আরও এগিয়ে এল ইন্দ্রাণী মোহিনী পদক্ষেপে। যেন হাঁটছে না – নেচে নেচে আসছে। কথা বলছে তালে – তালে, "বিক্রমজিৎ! বিক্রমজিৎ! নীরব কেন? আমার সৌন্দর্যের প্রশস্তি কি তোমার কণ্ঠে শুনতে পাব না? বলো না, আমাকেই বিয়ে করতে চাও!"

সম্মোহিতের মতোই বলে গেল বিক্রমজিৎ, "নিশ্চয়ই চাই তোমাকে বিয়ে করতে। কেন না, তোমার মতো সুন্দরী আজও তো আমি দেখিনি কোথাও। যে রূপ শুধু কল্পনায় আনা যায় – এ তো সেই রূপ! যে গান শুনলে মানুষ সব দুঃখ ভুলে যায় – তোমার কথার মধ্যে যেন সেই গানই শুনছি আমি! ইন্দ্রাণী, অচিন গ্রহের অপরূপা – কিংবদন্তি কিন্নরীও যে তোমার মতো রূপসী নয়।"

মৃদু হাসল ইন্দ্রাণী। দুই ঠোঁটের মাঝে ঝিকমিকিয়ে উঠল রসায়নশুভ্র দাঁতের পাটি। বললে কেমিক্যাল মসৃণ কণ্ঠে, "তবে এসো -"

এই কথাটা শেষ হতে না হতেই ঘটে গেল একটা অঘটন!

শূন্যে মিলিয়ে গেল বিক্রমজিৎ!

অস্ফুট স্বরে বলেছিল ইন্দ্রাণী—একী!

অমনি দেওয়ালের গা থেকে ভেসে এসেছিল ইলেকট্রনি ব্রেনের গমগমে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

ইন্দ্রাণী, জেটারশ্মি এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে গেল বিক্রমজিৎকে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু সে আবার আসবে রাডাগ্রহে – তখন তাকে বন্দি করবই। তার আগে জমি তৈরি করতে হবে। অনেক কাজ বাকি!

সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রমজিৎ। তার মাথার ওপর পরিচিত সুনীল আকাশ। সেখানে ভাসছে কাশফুলের মতো সাদা মেঘ।

সম্মোহনের ঘোর কেটে গেছে এক ঝটিকায়। চিন্তার তুফান ছুটছে মাথার মধ্যে।

ইন্দ্রাণী! ক্ষণেকের জন্যে পাগল করে দিয়েছিল বটে। ভুলেই গেছিলাম রঞ্জনার কথা। কিন্তু এখন ঘোর কেটেছে – কারণ ইন্দ্রাণী এখন অনেক ... অনেক দূরে!

জেট চালিয়ে শূন্যে উঠে পড়ে বিক্রমজিৎ। চিন্তার আবর্ত তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। সম্মোহিত অবস্থায় যা সে খেয়াল করেনি – ঘোর কেটে যাওয়ায় এখন তার হদিস মিলেছে।

ইন্দ্রাণীকে দেখতে অবিকল কুহকিনী লোরেলির মতো। কিন্তু সে তো অলীক কল্পনা। বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই লোরেলির।

আছে শুধু বিক্রমজিতের মগজে। অথচ কল্পনার কিন্নরী মূর্তিকেই একটু আগে সে দেখেছে, তার কথা শুনেছে...।

পৃথিবীর মিষ্টি বাতাস বুক ভরে টেনে নিচ্ছে আর সাত পাঁচ চিন্তায় যখন মশগুল হয়ে রয়েছে বিক্রমজিৎ, তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে, তিন হাজার পরার্ধ মাইল দূরে মহাদেশের মতো বিরাট স্পেসশিপে একাকিনী ইন্দ্রাণী কি ভাবছে? কি করছে?

সে দাঁড়িয়ে আছে লীলায়িত ভঙ্গিমায় তার ইলেকট্রনি ব্রেন নামে অসীম শক্তিধর মেশিনটার সামনে। এ ঘরে এখন আর অন্ধকার নেই। বিচিত্র যন্ত্রটাকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, তার আকৃতি প্রায় পুরাণ উপকথার দৈত্যদের মতোই। শুধু যা জ্যামিতিক রেখা, কোণ আর বৃত্ত দিয়ে গড়া তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তার মুণ্ড বলতে একটা বিরাট কালো বাক্স। বাক্সর সামনে একটা সার্চলাইট। এই সার্চলাইটে এখন চাপা আভা।

যত অসাধারণ শক্তিই থাকুক না কেন এই যন্ত্রের, ইন্দ্রাণীর ক্রীতদাস সে। তার হুকুমের গোলাম।

রাগে ফুসছে ইন্দ্রাণী। কিংবদন্তির লোরেলি রেগে অগ্নিশর্মা হলে তাকে কি রকম দেখায়, তা কেউ জানে না। কিন্তু এখন যা দেখা যাচ্ছে, রাগলে তাকে নিশ্চয় শতগুণে সুন্দরী দেখায়। হাঁটু পর্যন্ত চুল দুলে দুলে নেচে নেচে উঠছে তার কথায় তালে তালে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। নীল চোখ দিয়ে ঠিকরোচ্ছে নীল আগুন। কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে শঙ্খধ্বনি।

ইন্দ্রাণী বলছে বাঁ হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে – ইলেকট্রনি ব্রেন! ইলেকট্রনি ব্রেন! জেটারশ্মি চোখের পাতা ফেলবার আগেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল বিক্রমজিৎকে

আমারই সামনে থেকে – কিছুই করতে পারলে না তুমি? ধিক তোমাকে।

ইলেকট্রনি ব্রেন মানুষ নয় – যন্ত্র। সুতরাং ধমক খেয়ে মুষড়ে পড়ে না – রেগেও যায় না। তার গলাবাজিতে নেই আবেগের উত্তাপ।

বললে একঘেয়ে যান্ত্রিক স্বরে – ইন্দ্রাণী, জেটারশ্মি আসলে মহাজাগতিক শক্তিপুঞ্জ – তার ক্ষমতার কাছে আমাদের মতো যন্ত্র কিছুই নয়। আমরা তৈরি হয়েছি মানুষের হাতে – জেটারশ্মিকে তৈরি করেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি বানিয়েছেন, তিনি।

থাক্ থাক্। সাফাই গাইতে আর হবে না। যা হুকুম দিচ্ছি, অক্ষরে অক্ষরে তা তামিল করো।

কী হুকুম? যেন এক পায়ে খাড়া যন্ত্রের গোলাম।

বিক্রমজিৎ যে সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চায়, হাতে হাতে তা পরীক্ষা করে দেখাও। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাই। তবেই তাকে বিয়ে করা যাবে।

তাই হবে, ইন্দ্রাণী।

রিপোর্টের প্রতীক্ষায় রইলাম, ঘাড় বেঁকিয়ে কম্বুকণ্ঠে বললে নীল নয়না। সত্যিই তার নীল চোখ দুটো যেন এই মুহূর্তে নীল আগুনের টুকরো হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গেছিল বিক্রমজিৎকে – ঠিক সেই মুহুর্তেই কিনা বেবাক মিলিয়ে গেল লোকটা।

আবার গমগমে গলায় ধীর স্থির ভাবে কথা বলে চলেছে ইলেকট্রনি ব্রেন – "ইন্দ্রাণী, বিক্রমজিতের মগজের চুলচেরা খবর নিয়েছি আমরা। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা কোশকে তন্নতন্ন করে দেখেছি। তার স্মৃতির ভাঁড়ারে যা কিছু জমা আছে – সব খবর এখন আমাদের কাছে। আমরা জানি, অতীতে বহুবার বহুভাবে বহু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রঞ্জনাকে বাঁচিয়েছে বিক্রমজিৎ। নিজের জীবন তুচ্ছ করে। ইন্দ্রাণী, আমাদের পরিকল্পনা মতো সে এখন ঠিক তাই করবে তোমার জন্যে। যদিও তা না করার মস্ত প্রলোভন থাকবে তার সামনে – তবুও নিজের জীবন তুচ্ছ করেও সে বাঁচাতে চাইবে তোমাকে।"

শুনে, কিছুটা প্রশমিত হয় ইন্দ্রাণীর নীল চোখের নীল আগুন।

দিনকয়েক পরের ঘটনা। বিক্রমজিৎ … শুধু বিক্রমজিৎই জানে, মহাশূন্যের বিস্ময় জেটারশ্মি কবে, কখন, কোথায় আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে।

সেই ভাবেই সে জায়গায় আগে থেকেই গিয়ে হাজির থাকে সে। আশ্চর্য হলুদ রশ্মি ঝলক দিয়ে উঠেই তাকে অণু পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করে দিয়ে পলক মধ্যে রাডাগ্রহে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে দেয় তার কান্তিময় আকৃতিকে।

আজকে জেটারশ্মি এসে পড়বে অস্ট্রেলিয়ার ডায়ামান্টিনা নদীর পাড়ে।

বিক্রমজিৎ লাল টিউনিক পরে হাঁটছে ঠিক সেই জায়গা দিয়ে।

মাথার ওপর ঝলসে উঠল জেটারশ্মি। মহাশূন্যের অতিশয় স্নিগ্ধ হলুদ রশ্মি আছড়ে পড়ল তার সর্বাঙ্গে – নিঃশব্দে ফেটে পড়ল যেন একটা আলোর বোমা।

তক্ষুনি ফিকে হয়ে এল ওর রক্তমাংসের দেহটা – মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই।

দৃপ্ত বপুটাকে একই সময়ে দেখা গেল তিন হাজার পরার্ধ মাইল দূরের রাডাগ্রহের পাথুরে অঞ্চলে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে শহরের বাড়িঘর দোর।

অদূরে রঞ্জনা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। মুখ তার দুশ্চিন্তায় কালো – ললাটে উদ্বেগের রেখা।

বায়ুবেগে ছুটে এল বিক্রমজিৎ। রঞ্জনার সামনে দাঁড়িয়ে বললে রুদ্ধশ্বাসে – কী হয়েছে?

সর্বনাশ হয়েছে, বিক্রমজিৎ। কোথেকে একটা বিশাল স্পেসশিপ আর একজন মাত্র মেয়ে এসে দখল করে নিয়েছে আমাদের শহর!

বিক্রমজিৎ ছুটে এসেছিল রঞ্জনা দিকেই। তার ভয়ার্ত কথাগুলো শুনেছিল এবং জবাবও দিতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তা আর হল না।

সহসা ইন্দ্রাণী আবির্ভূত হয়েছে রঞ্জনার পেছনে। বড় বড় পাথরগুলোর আড়াল থেকে কিন্নরী পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেই ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে আছে বিক্রমজিতের দিকে। তার নীল নয়নে সেই দুনিবার আকর্ষণ – সম্মোহনের আকর্ষণ।

চকিতে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হল বিক্রমজিৎ। ভুলে গেল রঞ্জনা তার বধূ। তার সঙ্গেই এক্ষুনি কথা বলা দরকার। ভুলে গেল ইন্দ্রাণী তার কেউ নয় – তার কাছে না যাওয়াই উচিত।

রঞ্জনা দেখেনি কে এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে।

সে দেখল, আচমকা মুখচ্ছবি পালটে গেল বিক্রমজিতের। বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখের পরতে পরতে! আচম্বিতে যেন এক জাদু হাওয়ার ঝাপটায় অন্তরে অন্তরে অন্য মানুষ হয়ে গেল বিক্রমজিৎ।

আর তার পরেই রঞ্জনাকে পাশ কাটিয়ে অলিম্পিক দৌড়বীরের মতো ধেয়ে গিয়ে ইন্দ্রাণীর দুহাত চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বলে ওঠে বিক্রমজিৎ, “তুমি!”

নীল নয়নে নিবিড় শান্তি বিছিয়ে চেয়ে থাকে ইন্দ্রাণী।

আর ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ে রঞ্জনা, “বিক্রমজিৎ! বিক্রমজিৎ! একী করছ? কার হাত ধরেছ? ওই মেয়েটাই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে – এর কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।”

অরণ্যে রোদন করে গেল রঞ্জনা। তার কথাগুলো বুক চাপড়ানো হাহাকারের মতো হা-হা-হা-হা করে হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে গেল বিক্রমজিতের মাথার ওপর দিয়ে …

গাঢ় কণ্ঠে সে তখন বলছে ইন্দ্রাণীকে, ‘পৃথিবীতে গিয়েও তোমার কথাই শুধু ভেবেছি, ইন্দ্রাণী। তোমাকে বিয়ে না করলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব আমি।”

“পাগল হলে কি চলে? মৃদু হেসে বলে ইন্দ্রাণী – সুস্থ মাথায় থাকতে হবে – তবেই না তুমি বিক্রমজিৎ!”

আর সইতে পারে না রঞ্জনা। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে দু-গাল বেয়ে। ছুটে গিয়ে বিক্রমজিতের দু-কাঁধ খামচে ধরে বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে, “বিক্রম! বিক্রম! সত্যিই কি পাগল হলে তুমি? ইন্দ্রাণী তোমার কে?”

পাথর কঠিন গলায় বললে বিক্রমজিৎ, “আমার ভাবী বউ। তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক রইল না, রঞ্জনা। এই নাও আমাদের বিয়ের আংটি।”

আঙুল থেকে সোনার আংটি খুলে রঞ্জনার দিকে ছুঁড়ে দেয় বিক্রমজিৎ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। বিয়ের আংটির আর কোনও দামই নেই ওর কাছে।

হু-হু করে কেঁদে ফেলে রঞ্জনা। আংটি গড়িয়ে গেছে পাথরের খাঁজে –

বিক্রমজিৎ আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই এগিয়ে এসেছে ইন্দ্রাণীর দিকে। সে এতক্ষণ পরম কৌতুকে নিরীক্ষণ করছিল আংটি নিক্ষেপের উপভোগ্য দৃশ্য।

বললে বিক্রমজিৎ, "ইন্দ্রাণী, আর আমার কোনও বন্ধন নেই।"

নীল নয়নে নীলচে রশ্মি জাগিয়ে বললে কিংবদন্তির কিন্নরী, "হ্যাঁ, এবার তোমাকে বিয়ে করা যাবে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে একহাত পেছনে বেঁকিয়ে, আর এক হাত সটান আকাশ পানে তুলে হাউই-এর মতো শূন্যে উঠে যায় ইন্দ্রাণী – যেতে যেতেই বলে সোল্লাসে, 'এসো! এসো! এসো! বিক্রমজিৎ রাডাগ্রহের আগুন্তি বিস্ময়গুলোর মাঝে বেড়াতে নিয়ে চলো আমাকে – তোমার ভাবী বউকে।"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই", বলে পিঠের জেট রকেট চালিয়ে বিক্রমজিৎও উঠে যায় শূন্যে।

কথাগুলো ভীষণ আনন্দে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখ দিয়ে বললেও বিক্রমজিতের মনের মধ্যে চিন্তার একটা কালো ছায়া আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে বারংবার। চিন্তাটা এইঃ

পিঠে জেট নেই ইন্দ্রাণীর অথচ রকেটের বেগে শূন্যে উঠে গেল কীভাবে?

প্রস্তর ভূমিতে মাথা হেঁট করে তখনও কেঁদেই চলেছে রঞ্জনা।

দেখতে দেখতে আকাশের বুকে দুটি বিন্দুতে পরিণত হয় বিক্রম আর ইন্দ্রাণী। যেন পরমানন্দে বিভোর দুটি বিহঙ্গ।

পাথরের বুকে আছড়ে পড়ে রঞ্জনা। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে উপুড় হয়ে শুয়ে।

তার চোখের এক হাত দূরেই ঝিলমিল ঝিলমিল করতে থাকে সোনার আংটিটা!

দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকার ওপর দিয়ে পাশাপাশি উড়ে যেতে-যেতে বললে ইন্দ্রাণী, "মেরু অঞ্চলের বরফগুহা তো দেখিয়ে আনলে বিক্রমজিৎ। কিন্তু এখানে কি আছে? এই উপত্যকায়? চাকতির মতো পাথরগুলো ওভাবে সাজানো কেন?"

জবাব দেওয়ার আগে আর – একবার অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্যটা দেখে নিল বিক্রমজিৎ – ইন্দ্রাণীর পিঠে নেই জেট – অথচ হালকা তুলোর মতোই সে ভেসে যাচ্ছে শূন্য পথে। ডানা নেই, জেট নেই – তবুও সে উড়ছে পাখির মতোই!

বিস্ময়বোধকে চেপে রেখে অট্টহেসে বললে বিক্রমজিৎ, "ইন্দ্রানী, পাথরের চাকতিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্পোর্টস করার ক্ষমতা আছে শুধু আমারই। এই খেলা দেখিয়েই রাডাগ্রহে 'চ্যাম্পিয়ন' খেতাব আমি পেয়েছি। এবার তুমি বলো, এ গ্রহকে এত সহজে জয় করলে কিভাবে?"

ইলেকট্রনি ব্রেনের দৌলতে, জবাব দেয় ইন্দ্রানী। স্পেসশিপকে সে চর্কিপাক দেওয়ায় রাডাগ্রহ ঘিরে, উড়িয়ে নিয়ে যায় একটার পর একটা শহরের ওপর দিয়ে। বিষম আতঙ্কে শহরগুলো থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যখন ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে স্পেসশিপের গায়ে লেগে – তখন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘোষণা করেছিল ইলেকট্রনি ব্রেন – মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! বিশেষ ধাতু দিয়ে তৈরি এই স্পেসশিপের গায়ে একটা টোলও ফেলতে পারবে না তোমাদের ক্ষেপণাস্ত্র। কিন্তু আমরা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি চক্ষের নিমেষে।

স্পেসশিপ তখন উড়ে যাচ্ছে সাগরের মতো একটা বিশাল সরোবরের ওপর দিয়ে। এখানকার মিষ্টি জল চালান যায় পাশের শহরের ঘরে ঘরে।

আচমকা নিউক্লিও-ডাইন্যাস্টি এনার্জি ফেটে পড়েছিল এই সরোবরের ওপর – বিধ্বংসী এই শক্তিধারা ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছিল বিশাল স্পেসশিপের তলদেশ থেকে।

মুহূর্তের মধ্যে অত বড় সরোবরের সমস্ত জল প্রচণ্ড শব্দে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছিল শূন্যে – জলহীন হয়ে গেছিল সাগর সমান সরোবর।

কান্নার রোল উঠেছিল শহরের ঘরে ঘরে। আতঙ্কের আর্তনাদে ফালাফালা হয়ে গেছিল আকাশ বাতাস।

আর নয়। আর নয়। আত্মসমর্পণ করা যাক এবার। আরও কয়েকটা সাগরের জল যদি এইভাবে উড়ে যায়, তাহলে তেষ্টার জল না পেয়েই মরতে হবে।

তাই আত্মসমর্পণ করেছিল রাডাগ্রহ – শুধু একটা সাগরকেই জলশূন্য হতে দেখে।

স্পেসশিপ থেকে নেমে এসেছিল বিজয়িনী ইন্দ্রনী। গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ যাতে তার ক্ষতি করতে না পারে, তাই ইলেকট্রনি ব্রেন তাকে ঘিরে গড়ে দিয়েছিল প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র।

রাডাগ্রহের বিজয়সৌধের শীর্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল কিংবদন্তির কিন্নরী – "শোনো রাডাগ্রহবাসীরা, আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেই মরবে। যে মুহূর্তে আমার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগবে – স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্পেসশিপ রুখে দাঁড়াবে। আমি ধ্বংস হলেই পাউডার বানিয়ে দেবে গোটা রাডাগ্রহকে। সাবধান – রাডাগ্রহবাসীরা – সাবধান!"

গল্প শেষ করে বাতাসের বুকে সাঁতার কাটার ভঙ্গিমায় ইন্দ্রাণী নেমে যায় নীচের দিকে। স্তূপাকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থালার আকারের পাথরগুলো কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছে জেগেছে তার মনে।

পেছন পেছন নেমে যায় বিক্রমজিৎও। তার নামবার ভঙ্গিমা অন্যরকম। যেন পোল্লায় একটা ঘুড়ি চড় চড় শব্দে গোৎ খেয়ে নেমে যাচ্ছে মর্ত্য অভিমুখে।

ইন্দ্রাণী ততক্ষণে গোল চাকতি পাথরগুলোর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অপূর্ব ভঙ্গিমায়। হাত বাড়িয়ে পাথর দেখাচ্ছে। আর বলছে, "অদ্ভুত গড়ন কিন্তু পাথরগুলোর। পাথরের অজস্র থালা। কেন এমন গড়ন, বিক্রমজিৎ?"

বিক্রমজিৎ নিজেও অবাক হয়েছে থালা-পাথর দেখে। চাকতি পাথর এখানে আগেও ছিল। এ উপত্যকার বৈশিষ্ট্য এই চাকতি পাথর। ডিসকাস থ্রো করার ভঙ্গিমায় এই পাথরগুলোকেই গায়ের জোরে বহু দূরে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে 'চ্যাম্পিয়ন' হওয়ার গৌরবও সে পেয়েছে। কিন্তু …

এখন যে চাকতি পাথরগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছেট স্তূপের আকারে, এগুলো যেন আরও বেশি নিখুঁত। মেশিনে তৈরি চাকা বলেই মনে হচ্ছে। এবড়ো

খেবড়ো প্রাকৃতিক পাথরগুলোও রয়েছে এখানে সেখানে – ঠিক যেভাবে ছিল চিরকাল – যাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে কত খেলাই না খেলেছে বিক্রমজিৎ …

কিন্তু মসৃণ কিনারার এ পাথরগুলো তো কোনোকালে ছিল না। এল কোত্থেকে?

বিস্ময়টা অকৃত্রিম বলে জবাবটাও দিয়েছিল সেইভাবে, “জানি না, ইন্দ্রাণী। আগে কখনও দেখিনি।”

আশ্চর্য পাথরগুলোকে আরও কাছ থেকে দেখবে বলে ইন্দ্রাণী তখন নামছে প্রস্তর উপত্যকায়। জমি থেকে পাঁচ ফুট ওপরে এসে শরীরটাকে সিধে করে নিয়ে টুপ করে লাফ দিয়ে নীচের দিকে।

পা স্পর্শ করল পাথর এবং তৎক্ষণাৎ পাথর ভেদ করে দুটো পা-ই ঢুকে গেল থকথকে কাদায়।

আঠার মতোই চটচটে কাদা। পা আর তুলতে পারছে না কিছুতেই।

আর্ত চিৎকারে খান খান হয়ে যায় নির্জন উপত্যকার নীরবতা, “বিক্রম! বিক্রম! আমি তলিয়ে যাচ্ছি। বাঁচাও।”

কাণ্ড দেখে থ হয়ে গেছে বিক্রমজিৎ নিজেও। আকাশ থেকে শুধু প্রস্তরভূমি মনে হলেও আসলে যে তা থকথকে চটচটে কাদার জলাভূমি, তা পা না দিলে তো বোঝার উপায় নেই। একী ভয়ানক চক্ষুভ্রম!

জেট চালিয়ে নক্ষত্রবেগে ইন্দ্রাণীর দিকে আসতে আসতে তাই গুরুগম্ভীর গলায় শুধু বলেছিল সে, “আসছি। ইন্দ্রাণী, আমি আসছি।”

পাথুরে জমিতে অবতীর্ণ হতে না হতেই আবার এক কাণ্ড। ইন্দ্রাণীকে ঘিরে অনেকগুলো উষ্ণ প্রস্রবণ অকস্মাৎ পাথর ফুঁড়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে উঠেছে ওপর দিকে। ইন্দ্রাণীও তলিয়ে গেছে কোমর পর্যন্ত। থকথকে চটচটে কাদা তাকে আরও টানছে – টেনে নামাচ্ছে পাতালের দিকে।

চক্ষুস্থির হয়ে যায় বিক্রমজিতের। খেলাধূলা করার বহু পরিচিত এই উপত্যকায় একী ভয়ানক খেলা শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ!

কানে তালা লেগে যাচ্ছে গরম জলের ফোয়ারাগুলোর শব্দে। পাথরের নীচে বন্দি ছিল এরা এতদিনে। ঘূণাক্ষরেও তো তার আভাস পাওয়া যায়নি আগে। অকস্মাৎ একই সঙ্গে সব কটির রুদ্ধ মুখ খুলে গেছে ইন্দ্রাণীকে ঘিরে।

সে বেচারা নিজেই এখন তলিয়ে যাচ্ছে পাথুরে রঙের থকথকে চটচটে কাদার গর্ভে।

সবেগে জেট চালিয়েই ইন্দ্রণীর দিকে ধেয়ে গেছিল বিক্রমজিৎ ...

কিন্তু ফোয়ারার জলের ছিটে গায়ে লাগতেই শূন্য পথেই পাকসাট মেরে সরে গেল দূরে ...

আকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দ্রাণী, “কি হল? কি হল? সরে যাচ্ছো কেন, বিক্রম?”

“যাচ্ছি ওই জলের জন্যে, ইন্দ্রাণী। এ তো জল নয় – অ্যাসিড। অ্যাসিডে ভিজে তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না – প্রাণটা যাবে তার আগেই।”

আর অ্যাসিড। ইন্দ্রাণী যে তলিয়ে যাচ্ছে আগের চেয়েও দ্রুতবেগে। কান্নায় বিকৃত হয়ে এসেছে আকুল চিৎকার, “বিক্রম! বিক্রম! তাড়াতাড়ি এসো—তাড়াতাড়ি!”

পাগলের মতো বিক্রমজিৎ তখন অজস্র ফোয়ারার মধ্যেও কোথাও একটা নিরাপদ ফাঁক খুঁজছে। শূন্যপথে বারবার ধেয়ে যাচ্ছে – পাকসাট খেয়ে উল্টেপাল্টে ডিগবাজি মেরে ছিটকে আসছে – নিরাপদ প্রবেশপথ নেই কোথাও। ফোয়ারাদের অ্যাসিড চারদিকেই ঝরছে সমানভাবে।

নেই। নেই। পথ নেই কোথাও।

ইন্দ্রাণীও তা দেখেছে বইকি। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার কাছ পর্যন্ত যে আসতে পারছে না বিক্রমজিৎ, ইন্দ্রাণী তা লক্ষ্য করেই প্রস্রবণদের গর্জনের ওপর গলা তুলে বললে বুকফাটা চিৎকারে, “বৃথা চেষ্টা, পারবে না। আমাকে বাঁচাতে। পালাও – প্রাণ নিয়ে পালাও, বিক্রমজিৎ। নিজেকে বাঁচাও।”

বিক্রমজিৎ যে সে-ধাতু দিয়ে গড়া নয়। বিপদে যে পড়ে, প্রাণ বিপন্ন করে তাকে বাঁচানোই যে তার জীবনের পরম ধর্ম।

তাই শুধু বলেছিল নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, “ইন্দ্রাণী, তা হয় না। আমার প্রাণ যায় যাক – তবুও তোমাকে ফেলে যাব না।”

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। ওর স্মৃতির মণিকোঠায়। কী আশ্চর্য! ঠিক এই কথাগুলোই তো রঞ্জনা তাকে বলেছিল সমুদ্র দানব পরিবৃত অবস্থায় – বিক্রমজিৎ নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও ছুটে গেছিল তাকে বাঁচাতে।

একই কথা একই সুরে ধ্বনিত হচ্ছে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে! এ কী করে হয়? তবে কি ইলেকট্রনি ব্রেন বিক্রমের মাথা হাতড়ে তুলে নিয়েছে স্মৃতি স্নিগ্ধ কথাগুলো? একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে যাচাই করে দেখছে, সত্যিই ইন্দ্রাণীকে বাঁচানোর জন্যে মরণাপণ লড়াই করে কিনা বিক্রমজিৎ?

অবশ্যই তাই। মেশিনে তৈরি গোল পাথর, পাথর ফুঁড়ে অ্যাসিড প্রস্রবণ, প্রস্তরভূমির কাদা জলায় রূপান্তর – সবই তাহলে ইলেকট্রনি ব্রেনের কীর্তি।

ছলনা। যাচাই করা হচ্ছে বিক্রমজিৎকে।

ইন্দ্রাণী দেখতে চায়, রঞ্জনাকে যেভাবে বাঁচিয়েছিল বিক্রম, সেইভাবেই তাকেও বাঁচাতে পারে কি না। নিজেকে অবশ্যই সে বাঁচাতে পারে – ইচ্ছে করলেই টেলিপোর্টেশনাল রশ্মিবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে কাদাজলার ভেতর থেকে।

কিন্তু তা তো করছে না ইন্দ্রাণী। উলটে যেন বিক্রমজিৎকেই বাঁচাতে চাইছে নিজে মরে।

মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! ডাহা মিথ্যে বলে চলেছে ইন্দ্রাণী। কেন না, ইন্দ্রাণীটিই কিছুক্ষণ আগে বলেছে – তার মৃত্যু হলেই স্পেসশিপ ধ্বংস করে দেবে গোটা রাডাগ্রহকে। তাহলে তো মৃত্যু হবে বিক্রমেরও। তাহলে নিজে মরে বিক্রমকে বাঁচানোর কথাটা স্রেফ ছলনা।

বাঁচানোর পথ নিশ্চয় আছে। পরীক্ষা হচ্ছে বিক্রমের – শেষপর্যন্ত পথটা সে বের করতে পারে কিনা দেখা হচ্ছে ন্যাকামি করে।

রোখ চেপে যায় বিক্রমজিতের। শক্ত চোখে খুঁটিয়ে দেখে – কোথায় আছে সেই পথ?

অ্যাসিড ঝরছে অবিরল – অ্যাসিড বৃষ্টি ধুইয়ে দিচ্ছে পাথুরে জমি – পা রাখার জায়গাও নেই কোথাও।

হঠাৎ চোখে পড়ে চাকতি পাথরগুলোর দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি খুলে যায় বিক্রমের।

বারকোশের মতো বিশাল পাথর – দু হাতে তুলে মাথার ওপর ধরলেই তো ছাতা বানিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু পাথরের জুতোও যে দরকার।

রশ্মিবন্দুক হাতে নেয় বিক্রম। একটা পাথর বারকোশের ওপর দু-জায়গায় রশ্মিবর্ষণ করতেই পা গলানোর মতো দুটো ফুটো হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

রশ্মিবন্দুক কোমরে রেখে পা গলিয়ে নেয় ফুটো দুটোয়, দু-হাতে আর-একটা পাথর বারকোশ তুলে নিয়ে ধরে মাথার ওপর।

জেটের ধাক্কায় উঠে যায় শূন্যে। ধেয়ে যায় অ্যাসিড বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ইন্দ্রাণীর পাশে গিয়েই হেঁকে বলে ওঠে, ‘পায়ের তলার গোল পাথরটার ফুটোয় হাত গলিয়ে চেপে ধরো জোরাসে – জেট চালিয়ে টেনে তুলছি। কাদা থেকে।”

ইন্দ্রাণীর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে। নীল চোখ পরমানন্দে নোচে-নেচে উঠছে। দু হাত উঁচু করে গলিয়ে দেয় পাথরের পাশাপাশি ফুটো দুটোয়।

জেটের হ্যাঁচকা টানে শূন্যে উঠে যায় বিক্রম – তলায় উঠে আসে ইন্দ্রাণী – মাথার ওপর তার পাথরের বারকোশ – তার ওপর দাঁড়িয়ে বিক্রম – সে-ও ধরে আছে আর একটা গোল পাথর মাথার ওপর।

অ্যাসিড বৃষ্টি স্পর্শ করতে পারে না দুজনের কাউকেই।

নিরাপদ দূরত্বে এসেই মাথার ওপরকার পাথর ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিক্রম – হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে তুলে নেয় পায়ের তলার পাথরের ওপর।

এবং একটা কাণ্ড করে বসে সঙ্গে সঙ্গে।

খপ করে চেপে ধরে ইন্দ্রাণীর কোমরবন্ধনীতে লাগানো গোল পাথরটা – হীরের মতোই যা ঝকঝক করছিল দিনের আলোয়।

চক্ষের পলকে ছিনিয়ে নেয় বেল্ট থেকে।

ঝকমকে পাথর এখন বিক্রমের হাতে।

আঁতকে উঠেছিল ইন্দ্রাণী, "একী করছ! একী করছ, বিক্রম!"

গর্জে উঠে বিক্রমজিৎ, "ঠিকই করছি, ইন্দ্রানী। এই পাথর তো তোমাকে বানিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রনি ব্রেন, তাই না?"

"দাও, ফিরিয়ে দাও। ছোঁ মারে ইন্দ্রাণী।"

মুঠোয় ধরা পাথর তার নাগালের বাইরে রেখে বজ্রকঠিন স্বরে বলেই চলে বিক্রমজিৎ, "ছলনাময়ী! এত উঁচুতে লম্ফঝম্ফ করতে যেও না – ঠেলে দিলেই আছড়ে পড়বে নীচে। ওড়বার ক্ষমতা আর তোমার নেই – সে ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছিল এই পাথর – ইলেকট্রনি ব্রেনের অবদান।"

মুখ শুকিয়ে গেছে ইন্দ্রাণীর, "তু-তুমি জানলে কী করে?"

দু-চোখ খোলা রেখে চলি বলে। স্পেসশিপে যখন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম – এ পাথর ছিল না তোমার বেল্টে। তখন তুমি বলেছিলে, মাধ্যাকর্ষণের ভয়ে কোনও গ্রহেই যেতে পারো না। এখন তুমি মাধ্যাকর্ষণকে জয় করেছো। রাডাগ্রহে টহল তো দিচ্ছই – জেট রকেট ছাড়াই শূন্যে উড়ছো। আর এখনই তোমার বেল্টে রয়েছে এই পাথর। ইন্দ্রাণী, বিক্রমজিৎ আহাম্মক নয়। কাদাজলা থেকে তুমি নিজেই বেরিয়ে যেতে পারতে এই পাথরের জোরে – তবুও আমাকে মেহনৎ করিয়েছ – দেখছিলে সত্যিই তোমার বর হওয়ার উপযুক্ত কিনা আমি – রঞ্জনাকে যেভাবে বঁচিয়েছি বহুবার সেইভাবেই বাঁচাতে চেষ্টা করি কিনা। যদি না করতাম – আমারও শেষদিন, ঘনিয়ে আসত তক্ষুনি। – নামো, নেমে দাঁড়াও। এসে গেছে। রঞ্জনা।"

সত্যিই ভোজবাজির মতো ফাঁকা প্রান্তরে আবির্ভাব ঘটেছে রঞ্জনার। আসছে ছুটতে ছুটতে। বিষম খুশিতে ঝলমল করছে মুখখানা।

দূর থেকেই সে দেখেছে, আকাশ থেকে পাক দিতে দিতে নেমে আসছে পাথরের বারকোশ। তার ওপর দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী আর বিক্রমজিৎ।

গোল পাথর ভূমিস্পর্শ করতেই ইন্দ্রাণীকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে বিক্রমজিৎ। ঘৃণায় শক্ত তার ঠোঁট।

হাসতে হাসতে দৌড়ে এসে বলে ওঠে রঞ্জনা, "বিক্রম। বিক্রম। পেটে পেটে তোমার এত বুদ্ধি। বিয়ের আংটি বলে ছুঁড়ে ফেলে গেলে যে আংটিটা – সে আংটি যে কোন কালেই তোমাকে আমি দিইনি – তা মনে পড়ল আংটিটার দিকে চেয়ে থাকবার সময়। টনক নড়ল তখুনি। আংটি ফেলে গেল কেন? তাহলে কি আংটির মধ্যেই কোনও খবর রেখে গেলে আমার জন্যে? তুলে নিলাম আংটি। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় ফেলতেই দেখলাম তোমার আশ্বাসবাণী – রঞ্জনা, ভেবো না। অভিনয় করে যাচ্ছি। শুধু রাডাগ্রহকে বাঁচানোর জন্যে।"

দাঁতে দাঁত পিষে ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বললে বিক্রমজিৎ, "হ্যাঁ, অভিনয় ছাড়া আর পথ ছিল না। ইলেকট্রনি ব্রেন আর ইন্দ্রাণী – এদের যুগ্ম ছলনা আর ষড়যন্ত্রের ইতি ঘটানোর জন্যে প্রতারণার মুখোশ পরতে হয়েছে আমাকেও। ইন্দ্রাণী এখন শক্তিহীনা-"

ককিয়ে ওঠে ইন্দ্রাণী, "বিক্রম। বিক্রম। দয়া করো। ফিরিয়ে দাও ওই পাথর – গায়ে লাগিয়ে না রাখলেই আমার যে মৃত্যু অবধারিত – সাতদিনের মধ্যেই।"

তোমার ইলেকট্রনি ব্রেন আর স্পেসশিপের হিল্লেটা আগে করি, গর্জে ওঠে বিক্রমজিৎ। সাবধান, ইন্দ্রাণী। বেচাল দেখলেই ধ্বংস করব এই পাথর – ইলেকট্রনি ব্রেনেরও ক্ষমতা হবে না তোমার মৃত্যু আটকানোর। চলো – এসো, রঞ্জনা – নিয়ে এসো ইন্দ্রাণী ছলনাময়ীকে।

পরের দিনই বিশাল স্পেসশিপকে অ্যালফা-সেন্টরি নক্ষত্রপুঞ্জের একেবারে শেষ কিনারায় রেখে দিয়ে এল বিক্রমজিৎ। রাডাগ্রহেরই একটা স্পেসশিপ দিয়ে গাধাবোটের মতো টেনে নিয়ে গেল পোল্লায় মহাকাশযানকে। ইলেকট্রনি ব্রেন ট্যাঁ-ফুঁ করেনি। ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে নতুন নির্দেশ না আসায়।

যন্ত্র সে-মানুষের ক্রীতদাস। স্বইচ্ছায় কিছুই করার ক্ষমতা নেই তার।

মনিব মানবীটাকেই তো কব্জায় রেখেছে বিক্রমজিৎ – বেল্টের পাথর হাতড়ে নিয়ে।

তিনদিন পর। ইন্দ্রাণীকে পাথর ফিরিয়ে দিল বিক্রমজিৎ।

দুই চোখও তার পাথরের মতো কঠিন।

হাত বাড়িয়ে পাথরটা নিল বটে ইন্দ্রাণী – কিন্তু ম্লান মুখ আর উজ্জ্বল হল না।

বললে বিষণ্ন স্বরে, "ফিরিয়ে দিলে কেন?"

কারণ, বললে বিক্রমজিৎ, "ওটাতো আসলে একটা পাথর নয় – একটা যন্ত্র। যন্ত্রের যে অংশটার শক্তিতে তুমি শূন্যে উড়ে চম্পট দিতে পারতে – সেটা নষ্ট করে দিয়েছি। এখন তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মতোই চলাফেরা করবে। রাডাগ্রহে হয়তো একটা বরও জুটে যাবে। কিন্তু দয়া করে লোরেলি হওয়ার চেষ্টা আর কোরো না।

"চেষ্টা তো করেছিল", হাসিমুখে পাশ থেকে বলে ওঠে রঞ্জনা, "তখন তুমি কিভাবে বাঁচিয়েছিলে নিজেকে।"

হেসে ফেলে বিক্রমজিৎ, "খুব সহজে। ইন্দ্রাণীর দিকে যখনি চেয়েছি – তখনি জোর করে মনের চোখে আমি দেখতে চেয়েছি তোমাকে – দেখেওছি। তাই লোরেলিরূপিনী ইন্দ্রাণীর হার হয়েছে আমার কাছে।"

চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে ইন্দ্রাণী, "একটা বড় শিক্ষা হল আমার। যন্ত্র যত সেবাই করুক না মানুষের – মনের মতো বর জুটিয়ে দিতে পারে না কোনও মেয়েরই।"

'পারে কেবল মানুষ।" সমস্বরে বললে রঞ্জনা আর বিক্রমজিৎ।

কল্পবিশ্ব সম্পাদকঃ বিক্রমজিতের এই কাহিনি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল একাদশ ফ্যানট্যাসটিক বার্ষিকীতে ১৯৮৮ সালে। লেখকের অনুমতি নিয়ে কল্পবিশ্বে পুনঃপ্রকাশিত হল উপন্যাসটি।